সংবাদ

তারিখ ... AUG. 2.4 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ... ১......

বিজ্ঞান শিক্ষায় নারী-পুরুষ বৈষম্য

প্রদীপ দেব

১

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে পুরুষ তার প্রাথমিক শক্তিমত্তা প্রদর্শন করার জন্য প্রথমেই বেছে নিয়েছে নারীকে। মানুষ যখন থেকে বায়োলজিকেলি 'হোমোসেপিয়ানস' বা 'মানুষ' হয়ে উঠেছে তখন থেকে শুরু করে এ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এ শক্তির সংঘাত থামেনি। কালের বিবর্তনে এ সংঘাত কিছুটা পরিশীলিত হয়েছে, কিন্তু মৌলিক কোন পরিবর্তন সেভাবে ঘটেনি। ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনেক রকম মতবাদ থাকা সত্ত্বেও, অনেক সংঘাত থাকা সত্ত্বে পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ সেরকম পরিস্থিতির চাপে না পড়লে সাম্প্রদায়িকতা গোপন করে রাখে। কিন্তু নারী আর পুরুষ একে অপরের পরিপূরক হলেও সর্বত্র সমদর্শন ও সমান ক্ষমতায়নের আধুনিক মতবাদে বিশ্বাস করার পরও কিছুতেই পরস্পর অসাম্প্রদায়িক হতে পারছে না। নারী ও পুরুষের মধ্যে লৈঙ্গিক সাম্প্রদায়িকতা সূক্ষ্মভাবে রয়েই গেছে। নারী ও পুরুষ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী। সৃষ্টির জন্য, উন্নতির জন্য বা যূথবদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য কিছু সূক্ষ্ম সুস্থ প্রতিযোগিতার দরকার হয়তো আছে। আবার এ প্রতিযোগিতার কারণেই রয়ে যাচ্ছে লৈঙ্গিক বৈষম্য। নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক বৈষম্যগুলো আমরা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছি। কিন্তু সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে, ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে, মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বা গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে আরোপিত বৈষম্যগুলো মেনে নেয়াটা আধুনিকতা নয়, প্রগতিশীলতা তো নয়ই।

২

আমাদের বাংলাদেশের মতো দেশের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে বলা যায় আমরা আলোর মুখ দেখেছি দেরিতে, আলোকিত হয়ে উঠতে আমাদের কিছুটা সময় তো লাগতেই পারে। কিন্তু আমেরিকার মতো দেশে নারী পুরুষের বৈষম্য কতটা দূর হয়েছে? একটা সময় ছিল যখন লেখাপড়ায় মেয়েদের উৎসাহ দেয়ার বদলে বাধা দেয়া হতো। কিন্তু সেসব দিন চলে গেছে প্রায় দেড়শ বছর আগে। এখন ইউরোপ আমেরিকার মতো দেশগুলোতে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে বাইরে থেকে দেখলে পুরুষ আর নারীতে কোন পার্থক্য নেই। পাবলিক প্লেসে আলাদা আলাদা রেস্টরুম আর হাসপাতালে আলাদা আলাদা ওয়ার্ড ছাড়া। মোটা দাগের আর কোন পার্থক্য দেখা যায় না নারী আর পুরুষের। কিন্তু ছেলেমেয়ে সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান শিক্ষায় বিশেষ করে মৌলিক বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ও পারদর্শিতা ছেলেদের তুলনায় অনেক কম। এ সংক্রান্ত একটা সাম্প্রতিক আমেরিকান পরিসংখ্যান দেখা যাক।

Women's Educational Equity Act (WEEA) এর Equity Resource Center সম্প্রতি যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে আমেরিকার মোট মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর অর্ধেকেরও বেশি হলেন নারী। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে দৃশ্যটা মোটেও সুখকর নয়। একাডেমিক ফ্যাকালটি পজিশনগুলোর শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ হলেন নারী। কিন্তু যখনই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পদগুলোর হিসাব নেয়া হয়, দেখা যাচ্ছে নারীর সংখ্যা শতকরা মাত্র চব্বিশজন। বিষয়ভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে একশ' জন পদার্থবিজ্ঞানীর মধ্যে মাত্র নয়জন নারী। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা আরও কম। শতকরা মাত্র আটজন নারী ইঞ্জিনিয়ার আছে আমেরিকায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতে এ সংখ্যা আরও কম ছাড়া বেশি হবে না কিছুতেই। এ হলো কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি। নানারকম সামাজিক আর সাংসারিক কারণে অনেক নারীই হয়তো শিক্ষাজীবনের শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন না, বা করলেও হয়তো বিজ্ঞান বিষয় বাদ দিয়ে অন্য কোন বিষয়ে কাজ করেন। দেখা যাক, শিক্ষাজীবনের পরিসংখ্যান কী বলে। শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলে আর মেয়েতে খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না। বিজ্ঞান ও গণিতে তখন তাদের অংশগ্রহণ ও পারদর্শিতা প্রায় সমান। কিন্তু যতই তারা উঁচু ক্লাসে উঠতে থাকে, যতই তাদের বয়স বাড়ে, ছেলে আর মেয়েদের বিজ্ঞান ও গণিতে অংশগ্রহণ ও পারদর্শিতার পার্থক্য ততই বাড়তে থাকে।

আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশে সারাদেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিষয় ভিত্তিক কেমন উন্নতি করছে তা দেখার জন্য National Assessment of Educational Progress (NAEP) নামে একটা সমন্বিত মূল্যায়ন পরীক্ষার আয়োজন করা হয় প্রতিবছর। আমেরিকায় প্রতি বছর নয়, ১৩ আর ১৭ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এ মূল্যায়ন পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত কোন স্কোর প্রকাশ করা হয় না, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রের একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। NAEP এর স্কোর থেকে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা খারাপ করছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের গড় স্কোর আর মেয়েদের গড় স্কোরের পার্থক্য বেড়ে যাচ্ছে। একই রকম পড়াশোনার পরিবেশ, একই সুযোগ-সুবিধা, একই রকম সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থানে থাকার পরও দেখা যাচ্ছে ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় ভাল করছে গণিত, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে। এ তথ্য থেকে নানারকম মতবাদের সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চলছে এ বৈষম্যের কারণ খুঁজে বের করতে। কেউ কেউ বলছেন, ছেলেদের আর মেয়েদের মস্তিষ্কের গঠনের সূক্ষ্ম পার্থক্যের কারণে এটা হতে পারে। কেউ কেউ বলছেন এর কারণ জিনেটিক।

৩

ব্যাপারটা এখন এতই স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে যে, কোন সিদ্ধান্তে আসা তো দূরের কথা– কোন রকম মন্তব্য করতেও খুব সাবধানে করতে হয়। কারণ কখন কোন মন্তব্য থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে বলা মুশকিল। গতবছর জিনেটিক সম্ভাবনা সংক্রান্ত একটা মন্তব্য করে অনেকবার মাফ চেয়েও পার পাননি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট লরেনস সামারস।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ লরেনস সামার ক্লিনটন সরকারের সময়ে আমেরিকার ট্রেজারি সেক্রেটারি ছিলেন। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট পদে যোগ দিয়েছেন তিনবছর আগে। এ তিনবছরেই তিনি হার্ভার্ডের লেডি প্রফেসরদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছেন। এর মুখ্য কারণ হলো- ২০০৪ সালে হার্ভার্ডে বত্রিশ জন প্রফেসর নিয়োগ লাভ করলেও তার মধ্যে মাত্র চারজন হলেন নারী। এর থেকেই নাকি প্রমাণিত হয়– প্রেসিডেন্ট সামার নারীবিদ্বেষী। প্রফেসর সামার অবশ্য স্বাভাবিকভাবে অন্যযুক্তি দেখান। এজন্যই বলছিলাম ব্যাপারটা বড় বেশি স্পর্শকাতর এখন। আর কোথাও সুচ দেখলে তা ঘেঁটে চালুনি করে ফেলার জন্য মিডিয়া তো আছেই সবখানে। আমেরিকান মিডিয়াগুলো তিলকে সবসময়েই তাল করে; মাঝে মাঝে নারকেলও করে ফেলে। সেদিন ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ কনফারেন্সে আমেরিকার পঞ্চাশজন বাঘা বাঘা অর্থনীতিবিদদের সামনে প্রফেসর সামার ঠিক কোন কথাগুলো বলেছিলেন তা হুবহু জানার কোন উপায় নেই। কারণ সামারের বক্তৃতার কোন রেকর্ড নেই। তিনি লিখে আনেননি কিছু। যা মনে আসে বলেছেন। প্রতিবাদ ওঠার পরে তিনি নিশ্চয় আর কবুল করবেন না ঠিক কী বলেছিলেন। তার বক্তৃতা শোনার পরে ৫ জন লেডি প্রফেসর সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, তারা খুব অপমানিত বোধ করেছেন। আবার একই মিটিংয়ের অন্য ৪ জন লেডি প্রফেসর জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট সামারের বক্তৃতায় অপমানজনক কিছুই পাননি তারা। অনেকগুলো পেপার আর ইন্টারনেটের নিউজ সোর্স ঘেঁটে যেটুকু পেলাম তা মোটামুটি এরকম, মৌলিক বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ এত কম হওয়ার কারণ হিসেবে প্রেসিডেন্ট সামার তিনটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

মৌলিক বিজ্ঞানের একাডেমিক পজিশনে টিকে থাকতে গেলে গড়ে সপ্তাহে সত্তর থেকে আশি ঘণ্টা কাজ করতে হয়। সন্তান লালন পালন ও ঘর-সংসারে সময় দিতে হয় বলে মেয়েদের পক্ষে এত দীর্ঘ সময় কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই তারা এ বিষয়গুলোর প্রতি অনাগ্রহী।

* বিজ্ঞান ও গণিতে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় ভাল স্কোর করতে পারে না বলে তারা এমনিতেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। এর কারণ হিসেবে সামাজিক নানা বিষয়কে দায়ী করা হলেও জিনেটিক কারণটাকেও খতিয়ে দেখা দরকার।

* মেয়েরা সবসময় মনে করে, একাডেমিক লাইফে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এ মনোভাব থেকে তাদের ভেতরেও ছেলেদের প্রতি অবিচার করার একটা প্রবণতা তৈরি হতে পারে।

প্রফেসর সামার দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার নিজের মেয়ের উদাহরণ দিয়েছেন। ছোটবেলায় ছেলেরা গাড়ি নিয়ে আর মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলতে ভালবাসে। ছেলেমেয়েদের শৈশবের এ বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে তিনি তার মেয়েকে পুতুলের বদলে দুটো খেলনা ট্রাক কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল মেয়ে ট্রাক দুটি নিয়েই পুতুলের মতো খেলছে– একটা ট্রাকের নাম দিয়েছে 'ড্যাডি ট্রাক' অন্যটি 'বেবি ট্রাক'। বক্তৃতার এ পর্যায়ে অপমানিত বোধ করে কনফারেন্স হল থেকে বেরিয়ে যান এমআইটির প্রফেসর ন্যান্সি হপকিনস।

৪

একটা প্রশ্ন এখানে প্রকট হয়ে উঠছে, তা হলো আমরা কি মূল সমস্যার সমাধান চাই– নাকি কেবল আন্দোলন করে সময় কাটাতে চাই। সমস্যার সমাধান করতে চাইলে সবধরনের সম্ভাবনার কথাই তো বিবেচনা করে দেখা উচিত। প্রফেসর সামার একজন অর্থনীতিবিদ– বিজ্ঞানী নন। কিন্তু প্রফেসর ন্যান্সি হপকিনস তো আমেরিকার একজন প্রথম সারির জীববিজ্ঞানী। তার কি উচিত ছিল না কনফারেন্স রুমেই প্রেসিডেন্ট সামারকে প্রশ্ন করা? তিনি তো সামারের কথার ব্যাখ্যা চাইতে পারতেন। সবকিছু ভালভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যই তো কনফারেন্স। ভাষার জটিলতা বা দুর্বলতার কারণে যেন মূল বক্তব্য হারিয়ে না যায়, বা বিকৃত না হয় তা খুঁটিয়ে দেখাটা ভীষণ জরুরি। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে প্রফেসর হপকিনসের তা না জানার কথা নয়। কিন্তু তিনি তার বৈজ্ঞানিক দায়িত্ব পালন না করে করলেন কী– রুম ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'বেরিয়ে না এলে আমি হয়তো সেন্সলেস হয়ে যেতাম, নয়তো বমি করে দিতাম'। তার কথাগুলোকে অনেকেই বলছেন 'মেয়েলি আচরণ'। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে, কোন সমস্যা সমাধানে সেন্টিমেন্টাল এনার্জিকে খুব বেশি প্রাধান্য দিলে মূল সমস্যার সমাধান হয় না।

৫

মেয়েরা গণিত ও বিজ্ঞানে ছেলেদের তুলনায় কম মার্কস পাচ্ছে এই ফ্যাক্টের বিপরীতে এখন অন্য একটা ফ্যাক্টরের কথা বলা হচ্ছে। তা হলো– পরীক্ষায় হলে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সংখ্যা বেশি হলে মেয়েরা খারাপ স্কোর করে। আর মেয়েরা যদি সংখ্যায় ছেলেদের চেয়ে বেশি হয়– তখন মেয়েরাই ভাল স্কোর করে। এটা যদি সত্য হয়, তবে এর কারণ কী? মনোবৈজ্ঞানিক কোন কারণ নিশ্চয় আছে। বিজ্ঞান বিষয়ে নারী-পুরুষ বৈষম্যের সমস্যাটা সমাধানের ব্যাপারে আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে একটা নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

১৬ আগস্ট, ২০০৬
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া